ইউনিট

১৩ সুলতানি আমলে উপমহাদেশ

ভূমিকা

সুলতানি আমলে প্রশাসন, সামাজিক অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং স্থাপত্য শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সকল ছাত্র-ছাত্রীর সম্যক ধারণা থাকা উচিত। সেজন্য 'সুলতানি আমলে উপমহাদেশ' নামক ইউনিটটিকে চারটি পাঠে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম পাঠে সুলতানি আমলে প্রশাসনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সুলতানি আমলে শাসনের প্রকৃতি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আপনারা জানতে পারবেন। দ্বিতীয় পাঠে সুলতানি আমলে হিন্দু ও মুসলমান সমাজে সুবিধাভোগী ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের কথা আলোচনা করা হবে। তৃতীয় পাঠে সুলতানি আমলে উপমহাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ দেয়া হবে। চতুর্থ পাঠে থাকবে উপমহাদেশের স্থাপত্য শিল্পের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য কর্ম সম্পর্কে আলোচনা। সেই সাথে ইতিহাস, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির বিকাশে সুলতানদের ভূমিকা মূল্যায়ন করা হবে।

পাঠ ১

সুলতানি আমলে প্রশাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- সুলতানি আমলে শাসন ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- সুলতানি আমলে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- সুলতানি আমলের সামরিক বাহিনী সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- সুলতানি আমলে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।

সুলতানি আমলে শাসন ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য

সুলতানি আমলে ইসলাম ধর্মের রীতিনীতি অনুসারে দেশ শাসিত হতো। রাষ্ট্রীয় আইনের মূল উৎস ছিল কোরআন ও সুন্নাহ। শরিয়ত পরিপন্থী কোন আইন সুলতানগণ প্রণয়ন করতেন না। তবে তাই বলে এই শাসনব্যবস্থাকে ধর্মতান্ত্রিক (Theocratic) বলা সংগত নয়। সুলতানগণ ধর্মীয় নেতার মর্যাদা দাবি করতেন না। আলাউদ্দীন খলজী প্রশাসনকে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত করতে চেয়েছিলেন। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ছিল অমুসলমান। হিন্দু শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতে মুসলমান শাসনের সূত্রপাত হয়। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই হিন্দুগণ মুসলমান শাসন বিনা বাধায় মেনে নেয় নি। সুযোগ পেলেই তারা নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছে। এই চেষ্টার বহিঃপ্রকাশ ঘটে রাজা, মহারাজা ও সর্দারদের বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। সুলতানগণ বলপ্রয়োগের মাধ্যমে এই বিদ্রোহ দমন করেছেন। কিন্তু অমুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা হয় নি। নিজেদের ধর্ম পালনে তাদের স্বাধীনতা ছিল। তবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা বেশি পাওয়া যেতো বলে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছে। হিন্দুধর্মের কঠোর বর্ণভেদ প্রথার কারণে নিম্ন বর্ণের বহুলোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। সুলতানগণ বলপূর্বক অমুসলমানকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছেন-এই মতো পন্ডিতমহল এখন আর স্বীকার করেন না। অন্যান্য মুসলমান রাষ্ট্রের মতো দিল্লী সালতানাতের অমুসলমান প্রজাগণ ছিল 'জিম্মি' (Protected)। তাদের জানমাল, সম্মান, সম্পত্তি ইত্যাদি রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল প্রশাসনের। যে কোন মুসলমান প্রজা প্রয়োজনে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য ছিল।

সুলতানি আমলে ইসলাম ধর্মেও রীতিনীতি অনুসাওে দেশ শাসিত হতো। রাষ্ট্রীয় আইনের মূল উৎস ছিল কোরআন ও সুন্নাহ

অমুসলমানদেও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা হয়নি। নিজেদেও ধর্ম পালনে তাদেও স্বাধীনতা ছিল

কিন্তু জিম্মিদের বেলায় এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। সেজন্য যুদ্ধক্ষম পুরুষ জিম্মিদের জিজিয়া নামক কর প্রদান করতে হতো। নারী, শিশু, বিকলাঙ্গ ও পুরোহিতগণ এই কর প্রদান থেকে মুক্ত ছিল। দিল্লীর সুলতানগণ স্বৈরতান্ত্রিক (Autocratic) ছিলেন। তবে তাঁরা অত্যাচারী ছিলেন না। প্রজার কল্যাণ সাধন করাই ছিল তাঁদের শাসনের মূল লক্ষ্য। তাঁরা অভিজাতবর্গকে উপেক্ষা করতে পারতেন না। সুলতানি আমলে অভিজাতগণ ছিলেন "King makers and King breakers"। ১২০৬ থেকে ১২৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুলতান পদ বংশানুক্রমিক ছিল না। কিন্তু ১২৯০ থেকে সুলতান পদ বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে। ১২৯০ থেকে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খলজী, তুঘলক, সৈয়দ ও লোদী বংশ শাসন করে। এই বংশ পরিবর্তনের খেলায়ও অভিজাতদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ।

দিলস্নীর সুলতানগণ স্বৈরতান্ত্রিক (Autocratic) ছিলেন। তবে তাঁরা অত্যাচারী ছিলেন না। প্রজার কল্যাণ সাধন করাই ছিল তাঁদেও শাসনের মূল লক্ষ্য

সুলতান সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। প্রজাগণ সুলতানের নামে খুৎবা পাঠ করতো। সুলতান নিজ নামে মুদ্রা জারী করতেন। খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা জারী ছিল সার্বভৌমত্বের প্রতীক। কোন কোন সুলতান আব্বাসীয় খলিফার প্রতি শ্রদ্ধাবান হলেও এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ছিল আলংকারিক মাত্র। কোন কোন সুলতান নিজের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আব্বাসীয় খলিফার প্রতি মৌখিক আনুগত্য জ্ঞাপন করলেও ভারতের অভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক নীতিতে বাগদাদের কোন প্রভাব ছিল না। ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসীয় বংশের পতনের পর এই অলংকরণের প্রয়োজনও ফুরিয়ে যায়।

কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা

কেন্দ্রীয় শাসন পরিচালনার জন্য সুলতানের একটা মন্ত্রণা পরিষদ ছিল। মন্ত্রণা বা শাসন পরিষদ কয়েকটা দিওয়ান বা বিভাগ নিয়ে গঠিত ছিল। প্রধান মন্ত্রীকে বলা হতো উজির। তাঁর বিভাগকে বলা হতো দিওয়ান-ই-ওয়াজিরাত। দিওয়ান-ই-রিয়াসত, দিওয়ান-ই-খয়রাত, দিওয়ান-ই-মামালিক, দিওয়ান-ই-আরশ, দিওয়ান-ই-ইন্‌শা প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের নাম। বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ ছিলেন কাজী-উল-কুজ্জাত বা প্রধান কাজী। প্রত্যেক প্রধান শহরে একজন করে কাজী থাকতেন। কাজীর বিচার ছিল নিরপেক্ষতার প্রতীক। শোনা যায় অনেক সময় সুলতানকেও সামান্য আসামী হিসেবে কাজীর এজলাসে হাজির হতে হতো। কাজীকে তাঁর কাজে সাহায্য করতেন মুফতি। মুফতি আইনের ব্যাখ্যা করতেন। মুহতাসিব নামক কর্মকর্তা জনগণকে নৈতিক জীবন-যাপনে উদ্বুদ্ধ করতেন। রাষ্ট্রে কঠোর গুপ্তচর প্রথা ছিল। তাদের মাধ্যমে সুলতান রাষ্ট্রের সকল খবরাখবর পেতেন। কোতোয়াল শান্তি রক্ষা করতেন। অপরাধের শাস্তি ছিল অত্যন্ত কঠোর।

কাজীর বিচার ছিল নিরপেক্ষতার প্রতীক। শোনা যায় অনেক সময় সুলতানকেও সামান্য আসামী হিসেবে কাজীর এজলাসে হাজির হতে হতো

রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস

সুলতানি আমলে রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমিকর। ভূমিকরকে বলা হতো খারাজ। সিকান্দর লোদী জমি জরিপের ব্যবস্থা করেছিলেন। মসজিদ, খানকাহ ইত্যাদির জন্য নিষ্কর সম্পত্তি ছিল। এ ধরণের জমি লাখেরাজ নামে পরিচিত ছিল। মন্দিরের জন্যও নিষ্কর ভূমি বরাদ্দ ছিল। এ ধরণের জমিকে দেবোত্তর বলা হতো। খারাজ ব্যতিত জাকাত, খুমস, জিজিয়া প্রভৃতি থেকেও রাষ্ট্রের আয় হতো। মুসলমানগণ জাকাত এবং অমুসলমানগণ জিজিয়া প্রদান করতো। যুদ্ধলুণ্ঠিত সম্পদের $\frac{১}{৫}$ অংশ রাষ্ট্রের প্রাপ্য ছিল। একে বলা হতো 'খুম্‌স'। এসকল কর ছাড়াও প্রজাদের জলকর, গোচারণকর, গৃহকর প্রভৃতি দিতে হতো।

সুলতানি আমলে রাষ্ট্রেও আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমিকর। ভূমিকরকে বলা হতো খারাজ

সামরিক বাহিনী

সুলতানি আমলে সামরিক বাহিনী নিয়মিত ও অনিয়মিত এ দুভাগে বিভক্ত ছিল। প্রয়োজনের তাগিদে নিয়মিত সৈন্য ছাড়াও অনিয়মিত সৈন্যদের কাজে লাগান হতো। সৈন্যবাহিনীতে বেশির ভাগ সৈন্য ছিল পদাতিক। পদাতিক ছাড়া কিছু সংখ্যক অশ্বারোহী ও হস্তিবাহিনীও ছিল। যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র ছিল ঢাল-তলোয়ার, তীর-ধনুক, বর্শা ইত্যাদি। সুলতানি আমলে ভারতে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচলন হয় নি। তবে 'মনজালিক' নামক এক ধরণের ক্ষেপনাস্ত্র ছিল। এগুলো দিয়ে ভারী পাথর ইত্যাদি সামান্য দূরে

সুলতানি আমলে সামরিক বাহিনী নিয়মিত ও অনিয়মিত এ দুভাগে বিভক্ত ছিল

নিক্ষেপ করা যেতো। আলাউদ্দীন খলজী রাষ্ট্রীয় ঘোড়ার গায়ে 'দাগ' দেয়ার প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। ফিরোজ শাহ তুঘলকের সময় থেকে সামরিক বাহিনীতে শৈথিল্য দেখা দিতে থাকে।

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা

সুলতানি আমলে সাম্রাজ্য সীমা সব সময় একরকম ছিল না। আলাউদ্দীন খলজীর আগ পর্যন্ত দিল্লী সালতানাত শুধুমাত্র উত্তর-ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল। আলাউদ্দীন খলজী দক্ষিণ-ভারত জয় করেন। তবে তিনি দক্ষিণ-ভারত সরাসরি শাসনাধীনে আনেননি। বার্ষিক করদানের শর্তে দক্ষিণ-ভারতের রাজারা স্ব স্ব রাজ্য শাসন করতে থাকেন। মুহম্মদ বিন তুঘলক দক্ষিণ-ভারতের দেবগিরি, বরঙ্গল প্রভৃতি সরাসরি দিল্লী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করেন। দক্ষিণ-ভারতের বিজিত এলাকা তিনি কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করেন। মুহম্মদ বিন-তুঘলকের আমলেই বাংলা, মুলতান, বাহমনী রাজ্য, বিজয় নগর রাজ্য প্রভৃতি স্বাধীন হয়ে যায়। তৈমুর লং-এর ভারত আক্রমণের পর দিল্লী সালতানাত আরও সীমিত হয়ে পড়ে। সে যাই হোক, দিল্লীর সুলতানগণ তাঁদের সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করে শাসন করতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের উপাধি ছিল 'ওয়ালী'। প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় শাসন কাঠামোর আদলেই গড়ে উঠেছিল। প্রাদেশিক শাসকগণ কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজস্ব দিতেন। প্রয়োজনে সুলতানকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করাও তাদের দায়িত্ব ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ তাদের স্ব স্ব প্রদেশ আবার ছোট ছোট এলাকায় ভাগ করে শাসন করতেন। এ সব ছোট এলাকাকে 'ইকতা' এবং ইকতার শাসনকর্তাকে মুক্তা বলা হতো।

সার-সংক্ষেপ

সুলতানি আমলে শাসনব্যবস্থা শরিয়তভিত্তিক আইন অনুসারে পরিচালিত হতো। তবে এই শাসনব্যবস্থা ধর্মতান্ত্রিক ছিল না। সুলতানগণ স্বৈরাচারী হলেও অত্যাচারী ছিলেন না। অভিজাতগণ সুলতান নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। প্রাথমিক পর্যায়ে সুলতানের পদ বংশগত ছিল না। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে তা বংশগত হয়ে যায়। দিল্লী সালতানাত ছিল স্বাধীন ও সার্বভৌম। রাজস্বের উৎস ছিল খারাজ, জাকাৎ, খুমস, জিজিয়া ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় শাসন পরিচালনায় সুলতান উজির, কাজী, মুফতি, কোতোয়াল প্রভৃতি কর্মচারীর সহায়তা নিতেন। দেশে গুপ্তচর প্রথা ছিল। দন্ডবিধি ছিল কঠোর। সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণকে ওয়ালী বলা হতো। তাঁরা সুলতানের দরবারে রাজস্ব পাঠাতেন। প্রয়োজনে সুলতানকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করা তাদের দায়িত্ব ছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৩.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। দিল্লীর যে সুলতান প্রশাসনকে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত করতে চেয়েছিলেন–
   ক. ইলতুতমিস।
   খ. বলবন।
   গ. আলাউদ্দীন খলজী।
   ঘ. ফিরোজ শাহ তুঘলক।

২। জিজিয়া কর আরোপিত ছিল–
   ক. সকল হিন্দু নরনারীর উপর।
   খ. শুধুমাত্র রাজা ও রাজকুমারদের উপর।
   গ. শুধুমাত্র পুরোহিতদের উপর।
   ঘ. শুধুমাত্র যুদ্ধক্ষম পুরুষদের উপর।

৩। উজিরের বিভাগকে বলা হতো–
   ক. দিওয়ান-ই-ওয়াজিরাত।
   খ. দিওয়ান-ই-মামালিক।
   গ. দিওয়ান-ই-ইন্‌শা।
   ঘ. দিওয়ান-ই-রিয়াসত।

৪। যুদ্ধলুণ্ঠিত সম্পদের অংশ রাষ্ট্রের প্রাপ্য ছিল–

ক. $\frac{১}{২}$ অংশ।

খ. $\frac{১}{৫}$ অংশ।

গ. $\frac{১}{৩}$ অংশ।

ঘ. $\frac{১}{৬}$ অংশ।

৫। সুলতানি আমলে প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে বলা হতো–

ক. নবাব।

খ. নায়েব নাজিম।

গ. সুবাদার।

ঘ. ওয়ালী।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. সুলতানি আমলে ইসলাম ধর্মের রীতিনীতি অনুসারে দেশ শাসিত হত - এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

২. 'দিল্লীর সুলতানগণ স্বৈরতান্ত্রিক ছিলেন। তবে তাঁরা অত্যাচারী ছিলেন না' –প্রমাণ করুন।

৩. 'সুলতানি আমলে কাজীর বিচার ছিল নিরপেক্ষতার প্রতীক' -ব্যাখ্যা করুন।

৪. সুলতানি আমলে রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস কি কি ছিল? সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

পাঠ ২

সুলতানি আমলে সামাজিক অবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- সুলতানি আমলে মুসলমান সমাজের অবস্থা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- সুলতানি আমলে হিন্দু সমাজের অবস্থা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- তৎকালীন সমাজে নারীর স্থান নির্ধারণ করতে পারবেন।

সুলতানি আমল সামাজিক অবস্থা

সুলতানি আমলে সমাজ প্রধানত হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠিই ছিল অমুসলমান। অমুসলমানদের মধ্যে হিন্দু ছাড়া কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীও ছিল। হিন্দুদের পরাজিত করেই ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানগণ সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। অপরদিকে হিন্দুগণ পরাজিত হলেও তারা বিনা বাধায় কিংবা হৃষ্টচিত্তে মুসলমান শাসন মেনে নিতে পারেনি। প্রাচীন সভ্যতার অধিকারী হিসেবে স্বভাবত:ই তাদের মধ্যে অহংকারবোধ ছিল।

মুসলমান সমাজের অবস্থা

মুসলমান সমাজ আবার দু'ভাগে বিভক্ত ছিল - বহিরাগত অভিজাত শ্রেণী এবং স্থানীয় ধর্মান্তরিত সাধারণ শ্রেণী। অভিজাত শ্রেণী তুর্কি, ইরানি, তুরানি, আরব, আফগান ইত্যাদি নিয়ে গঠিত ছিল। বিজেতা হিসেবে তারা নিজেদেরকে শাসক শ্রেণী বলে মনে করতো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদেরকে শেখ, সৈয়দ, গাজী ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত করতো। রাষ্ট্রমধ্যে তারা সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। রাষ্ট্রের সকল গুরুত্বপূর্ণ পদ তাদের দখলে ছিল। তারাই প্রভাবশালী আমীর, উজির, কাজী, মুফতি, সেনানায়ক প্রভৃতি পদের অধিকারী হতেন। সুলতানও ছিলেন এসকল গোত্রের মধ্যে যে কোনটা থেকে মনোনীত। সুলতান যখন যে গোত্রের হতেন স্বাভাবিকভাবেই তখন সে গোত্র সমাজে সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করতো। এই অভিজাতগণ সুলতান নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। এই শেখ, সৈয়দ, পাঠান, মুঘলগন ভারতীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানদের অত্যন্ত হীন নজরে দেখতো। তাদের লোক-লৌকিকতা, আদান-প্রদান, সামাজিক মেলা-মেশা ও বিয়ে-শাদী সাধারণত নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো। তারা নিজেদেরকে আশরাফ এবং সাধারণ মানুষকে আতরাফ মনে করত। আশরাফ-আতরাফ মেলামেশা বিশেষ একটা হতো না। অনভিজাত ধর্মান্তরিত ভারতীয় মুসলমানগণ প্রায় ক্ষেত্রেই তাদের পূর্বজীবনযাত্রা প্রণালী ও পেশা অনুসরণ করতো। তাদের তধ্যে কেউ কেউ অবশ্য নিয়মিত বা অনিয়মিত সৈন্যবাহিনীতে সৈনিক হিসেবে যোগ দিতো। সেক্ষেত্রে সমাজে তাদের প্রভাব বেড়ে যেতো প্রতিপত্তি । ছোট-খাট ব্যবসা কিংবা চাকুরিও তারা করত। ইসলামি রীতিতে তাদের খৎনা, বিয়ে-শাদী, খানা-পিনা , অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হলেও পূর্ববর্তী রীতি-নীতি তারা সম্পূর্ণ বাদ দিতে পারেনি। তাদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন পাল-পার্বনের রেশ তখনো কিছুটা রয়ে গিয়েছিল। তাদের পোষাক পরিচ্ছদেও তেমন একটা পরিবর্তন আসে নি। অভিজাত মুসলমানগণ ইসলামি রীতির আচকান, পাজামা, পিরহান, পাগড়ী ইত্যাদি পরতেন। তারা খান, মালিক, আমীর ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ করতেন। সমাজে আলেমদের সম্মান ছিল। সুফি, দরবেশ, পীর-ফকিরগণ ইসলাম প্রচার করতেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই তাদের শ্রদ্ধার চোখে দেখতো।

হিন্দু সমাজের অবস্থা

হিন্দু সমাজে বর্ণভেদ প্রথা কঠোর আকার ধারণ করেছিল। সমাজে ব্রাহ্মণদের স্থান ছিল সর্বোচ্চ। তাঁরা পূজা-অর্চনার পাশাপাশি টোল, চতুষ্পাঠী ইত্যাদিতে শিক্ষকতা করতেন। মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও সমাজে তখনো ক্ষত্রিয়দের দাপট ছিল। তারা বিভিন্ন হিন্দু রাজা মহারাজার সৈন্যবাহিনীতে নিয়োজিত ছিলেন। কেউ কেউ সুলতান কিংবা কোন আমীরের সৈন্যদলেও ঢুকে পড়েছিলেন। জিজিয়া কর প্রদান করাকে এই ক্ষত্রিয়গণ খুবই অপমানজনক মনে করতেন। সেজন্য মাঝে মাঝেই রাজা মহারাজাদের বিদ্রোহ করতে তারা উৎসাহিত করতেন। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে

রাজপুতগণ খুব সাহসী ছিলেন। বৈশ্যগণ চাষবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি করে জীবিকা নির্বাহ করতো। উচ্চ তিন শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে বহুবিবাহ, বাল্য বিবাহ, সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। মুহম্মদ বিন তুঘলক এই প্রথা নিবারণের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু হিন্দুদের প্রবল বাধার কারণে তিনি সফল হতে পারেন নি। সমাজের নিম্নতম অবস্থানে ছিল শূদ্রগণ। কামার, কুমার, মুটে, মেথর, মুচি, ধীবর প্রভৃতিকে নীচ জাতি বলে গণ্য করা হতো। তারা সাধারণত গ্রাম বা শহরের একান্তে বাস করতো। তারা শিক্ষার আলো পেতোনা। অস্পৃশ্য হিসেবে তারা সমাজে অবহেলিত ও অপাংতেয় ছিল। সমাজের এই নিষ্ঠুর আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে এই সকল লোকদের অনেকেই সুফি-দরবেশ, পীর-ফকিরের সংস্পর্শে এসে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিচ্ছিল। বহু বৌদ্ধও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

দাস প্রথা

সমাজে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। হাট বাজারে দাস-দাসী কেনা-বেচা হতো। দাসগণ মানবেতর জীবন যাপন করতো। আলাউদ্দীন খলজীর অধীনে ৫০ হাজার এবং ফিরোজ তুঘলকের অধীনে ১ লক্ষ ৮০ হাজার ক্রীতদাস ছিল বলে সমসাময়িক ইতিহাস থেকে জানা যায়। কোন কোন ক্রীতদাস অবশ্য মেধার গুণে সমাজে ও রাষ্ট্রে নেতৃস্থানীয় পদ লাভ করেছিল। কেউ কেউ এমনকি সুলতানও হয়েছিলেন। তবে এরূপ ভাগ্যবানের সংখ্যা ছিল খুবই কম।

নারীর অবস্থা

হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেই নারীগণ স্বামী বা পুত্রের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। সমসাময়িক সাহিত্যে নারীদের যে চিত্র আঁকা হয়েছে তাতে দেখা যায় নারীগণ সন্তান ধারণ ও পালন ছাড়া ঘর গৃহস্থালীর কাজে ব্যস্ত থাকতো। নিম্নবর্ণের স্ত্রীগণ নিজ নিজ স্বামীর সাথে মাঠের কিংবা কামার কুমারের কাজেও যোগ দিতো। উচ্চবর্ণের মহিলাদের কেউ কেউ কাব্যচর্চা ও শিল্পকর্ম করতো। নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই শিক্ষার হার ছিল খুবই কম। সমাজের উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু মুসলমানগণ অবশ্য বিদ্যাচর্চা করতো। তবে বিদ্যালয় ও শিক্ষার উপকরণ যেহেতু ছিল অত্যন্ত অপ্রতুল সেহেতু তাদের বেশির ভাগই ছিলেন স্বশিক্ষিত। সমাজে শিক্ষিত ও গুণীজনের যথার্থ কদর ছিল।

সার-সংক্ষেপ

সুলতানি আমলে গোটা সমাজ হিন্দু ও মুসলমান এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। মুসলমান ও হিন্দু সমাজের উচ্চ শ্রেণী সুবিধা ভোগ করতো। দেশের আপামর জন সাধারণ ছিল সুবিধা বঞ্চিত। তারা মানবেতর জীবন যাপন করতো। সমাজে দাস প্রথা প্রচলিত ছিল। দাস-দাসীর জীবনও ছিল অত্যন্ত কষ্টকর। কোন কোন দাস অবশ্য মেধাবলে উচ্চ আসনে আসীন হয়েছিল। তবে তাদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। নারীগণ পুরুষদের উপর নির্ভরশীল ছিল। তারা গৃহস্থালী কাজকর্ম করতো। শিক্ষার হার ছিল কম। উচ্চবর্ণের লোকজন ও অভিজাতগণ লেখাপড়া শিখলেও সাধারণ মানুষ ছিল শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। সমাজে শিক্ষিত ও গুণী লোকের কদর ছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৩.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। সুলতানি আমলে সমাজ প্রধান যে দুই অংশে বিভক্ত ছিল–
   ক. হিন্দু ও বৌদ্ধ।
   খ. হিন্দু ও মুসলমান।
   গ. আশরাফ ও আতরাফ।
   ঘ. মুসলমান ও বৌদ্ধ।

২। সুলতানি আমলে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো দখলে ছিল–
   ক. অভিজাত মুসলমানদের।
   খ. হিন্দুদের।
   গ. ধর্মান্তরিত মুসলমানদের।
   ঘ. এদের সকলের।

৩। ফিরোজ শাহ তুঘলকের অধীনে ক্রীতদাস ছিল–
ক. ৫০ হাজার।
খ. ১ লক্ষ।
গ. ১ লক্ষ ২০ হাজার।
ঘ. ১ লক্ষ ৮০ হাজার।

৪। সুলতানি শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দু রাজা-মহারাজাদের বিদ্রোহ করতে উৎসাহিত করতো–
ক. ধর্মান্তরিত মুসলমানগণ।
খ. ব্রাহ্মণগণ।
গ. ক্ষত্রিয়গণ।
ঘ. বৈশ্যগণ।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. সুলতানি আমলে মুসলমান সমাজের অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
২. সুলতানি আমলে হিন্দু সমাজের অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
৩. সুলতানি আমলে সমাজে নারীর স্থান কিরূপ ছিল? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

পাঠ ৩

সুলতানি আমলে অর্থনৈতিক অবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- সুলতানি আমলে অর্থনৈতিক অবস্থা জানার উৎস সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবে।
- সুলতানি আমলের অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।

সুলতানি আমলে অর্থনৈতিক অবস্থা জানার উৎস

দিল্লীর সুলতানি আমলের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানার উৎস পর্যাপ্ত নয়। মিনহাজ-উস-সিরাজ, জিয়াউদ্দীন বারণী, শামস-ই-সিরাজ আফিফ, ইয়াহিয়া বিন-আহমদ প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ দিল্লী সালতানাতের রাজনৈতিক ইতিহাস বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। কিন্তু তাঁরা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তেমন কোন আলোকপাত করেন নি। তবে সুখের বিষয় এই যে কয়েকজন পর্যটক তাদের ভ্রমণবিবরণীতে এদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। তাঁদের লেখা থেকে আমরা সুলতানী আমলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারি। এসকল পর্যটকের মধ্যে মার্কো পোলো, ইবনে বতুতা, ওয়াসফ, ভারথেমা প্রমুখ প্রধান। বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের দরবারে চীনের সম্রাট একজন দূত পাঠিয়েছিলেন। সে দলে মাহুয়ান ছিলেন দোভাষী। মাহুয়ান বাংলার উপর এক মনোজ্ঞ বর্ণনা রেখে গেছেন। সে বর্ণনা থেকেও আমরা বাংলা তথা ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। মার্কো পোলো ও ইবনে বতুতা ব্রোচ ও কালিকট সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করেছেন। তারা বলেছেন যে, এ দুটি সে সময় খুবই সমৃদ্ধ বন্দর ছিল। ওয়াসফ সুরাট সম্পর্কে বলেছেন যে, এটি ধনপূর্ণ ও জনবহুল ছিল। এসকল বন্দর দিয়ে বহির্বিশ্বের সাথে ভারতের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য চলতো।

সুলতানি আমলে অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল

প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ছিল কৃষিজাত পণ্য, বস্ত্র ও নানা প্রকার মসলা। প্রধান আমদানি দ্রব্য ছিল বিলাস-সামগ্রী, ঘোড়া ও অন্যান্য ভারবাহী পশু। অনুমান করা যায় যে, দেশে কিছু লোক খুবই অবস্থাপন্ন ছিল। তাদের জন্যই বিলাস সামগ্রী, ঘোড়া ইত্যাদি আমদানি করা হতো। কিন্তু দেশের বেশির ভাগ লোক নিশ্চয়ই তেমন অবস্থাপন্ন ছিল না। সমাজের অধিকাংশ লোক অবশ্যই হতদরিদ্র ছিল। ইবনে বতুতা দেশে দাস-দাসী বেচাকেনা হতে দেখেছেন। সাধারণ মানুষের অভাব-অনটন না থাকলে দাস-দাসী বেচা কেনা হওয়ার কথা নয়। সাধারণ মানুষ কঠোর পরিশ্রম করতো। বতুতা মানুষকে সারাদিন মাঠে কাজ করতে দেখেছেন। শস্যশ্যামল মাঠ দেখেছেন নদীর দু'ধারে। ধান, গম, আখ, নানা রকম ডাল, সরিষা, তিল, তিসি, নারকেল, পান, সুপারি ইত্যাদি ছিল প্রধান উৎপন্ন ফসল। উৎপাদিত খাদ্যশস্য দেশের প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত থাকতো। তাই তা বিদেশে রপ্তানি হতো।

দেশে উন্নত মানের তুলা উৎপন্ন হতো। তা দিয়ে কাপড় তৈরি হতো। উৎকৃষ্ট মানের মসলিন বিদেশে রপ্তানি হতো। রেশমের চাষ হতো এবং রেশমী কাপড় বোনা হত। রেশমি কাপড়ও বিদেশ রপ্তানি করা হতো। মসলিনের জন্য বাংলাদেশ এবং রেশমি কাপড়ের জন্য গুজরাট বিখ্যাত ছিল। ভারথেমার মতানুসারে তুলা, আদা, শস্য ও নানাপ্রকার মাংসের প্রাচুর্যের জন্য বাংলাদেশ পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি পেয়েছিল।

বতুতা ও মাহুয়ান বাংলার অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের খুব প্রশংসা করেছেন। বতুতা বলেছেন বাংলাদেশের মতো সস্তা দামে জিনিসপত্র বিক্রি হতে তিনি আর কোথাও দেখেন নি। তিনি বলেছেন তিনজন লোকের পরিবারে বছরে ৮ দিরহামের বেশি খরচ হতো না। তবে এই আট দিরহাম জোগাড় করতে গরিব লোকদের নিশ্চয়ই খুব পরিশ্রম করতে হতো।

কৃষি ছিল প্রকৃতি নির্ভর। কোন কোন সুলতান অবশ্য কৃষির উন্নতির জন্য খাল কেটেছেন এবং চাষীদের ঋণ দিয়েছেন। শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে মসলিম, রেশমি কাপড়, কামার-কুমারের তৈরি পণ্য ছিল প্রধান। তবুও দেশে মাঝে মাঝেই দুর্ভিক্ষ হতো। দুর্ভিক্ষের সময় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যেতো। মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের সময় একবার দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। সে সময় শস্যের দাম মনপ্রতি ১৬/১৭ জিতল বেড়ে গিয়েছিল। তামার পয়সাকে বলা হতো জিতল। তখনকার এক জিতল

বর্তমানের প্রায় ছয় পয়সার সমান। আলাউদ্দীন খলজীর সময় ১ মন গমের দাম বেঁধে দেয়া হয়েছিল ৭$\frac{১}{২}$ জিতল। যেখানে ৭$\frac{১}{২}$ জিতল দিয়ে আলাউদ্দীন খলজীর সময় ১ মন গম পাওয়া যেতো, মাত্র কয়েকবছর পর তার দাম যদি ১৬/১৭ জিতল বেড়ে গিয়ে থাকে তাহলে ধারণা করা যায় যে, খাদ্য শস্যের দাম তিন গুণেরও বেশি বেড়ে গিয়েছিল।

স্বাভাবিক অবস্থায় জিনিসপত্রের দাম কম হলেও জনগণের জীবন-যাত্রার মান উন্নত ছিল না। তবে সে আমলে মানুষের চাহিদাও কম ছিল। লোকসংখ্যার তুলনায় চাষযোগ্য জমি, গোচারণ ভূমি ও বন-জংগল বেশি ছিল। তাই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের খুব একটা অভাব হতো না।

দেশে সোনা, রূপা ও তামার মুদ্রা প্রচলিত ছিল। অবশ্য সাধারণ মানুষ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কড়িই ব্যবহার করতো। তারা বন-জংগল থেকে বাড়ি-ঘর তৈরির উপকরণ, জ্বালানি ইত্যাদি জোগাড় করতো। শাসক শ্রেণী ও রাজকর্মচারীগণ বিলাসিতায় দিন কাটাতো। তারা দালান-কোঠায় বাস করতো। দামী কাপড়-চোপড়, গহনা ইত্যাদি ব্যবহার করতো। জনগণের একদল ছিল সুবিধা ভোগী, অপর দল সুবিধা বঞ্চিত। দুই শ্রেণীর জীবন যাত্রার মধ্যে পার্থক্য ছিল বিরাট।

সার-সংক্ষেপ

সুলতানি আমলের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আমরা মার্কো পোলো, ইবনে বতুতা ভারথেমা প্রমুখ পর্যটকদের লেখা থেকে ধারণা করতে পারি। ভারত সমৃদ্ধ ছিল। বিলাস দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি হতো। খাদ্যশস্য, মসলিন, রেশমি কাপড়, নানা প্রকার মসলা ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি হতো। আমির ও উচ্চ রাজকর্মচারীগণ ছিল ধনী। তারা বিলাসবহুল জীবন-যাপন করতো। দেশের জন সাধারণ ছিল দরিদ্র। তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হতো। ধনী-দরিদ্রের জীবন যাত্রার মানে বিরাট পার্থক্য ছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৩.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। চীনা দো-ভাষীর নাম–
   ক. মার্কো পোলো।
   খ. ইবনে বতুতা।
   গ. ভারথেমা।
   ঘ. মাহুয়ান।

২। বাজারের দাস-দাসী বিক্রি হওয়া থেকে ধারণা করা যায়–
   ক. দেশের সাধারণ মানুষের অভাব-অনটন ছিল।
   খ. দেশের সাধারণ মানুষের প্রাচুর্য ছিল।
   গ. দেশে প্রচুর উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছিল।
   ঘ. দেশে মানবতাবোধের অভাব ছিল।

৩। মুহম্মদ বিন-তুঘলকের সময় যে দুর্ভিক্ষ হয় তাতে খাদ্যশস্যের দাম মনপ্রতি বেড়ে গিয়েছিল–
   ক. ১৪/১৫ জিতল।
   খ. ১৬/১৭ জিতল।
   গ. ১৮/১৯ জিতল।
   ঘ. ২০/২১ জিতল।

৪। এদেশের মানুষকে ইবনে বতুতা দেখেছেন–
   ক. গল্প-গুজব করতে।
   খ. হাট-বাজার করতে।
   গ. মাঠে কাজ করতে।
   ঘ. কল কারখানায় পরিশ্রম করতে।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. সুলতানি আমলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা জানার উপকরণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

পাঠ ৪

সুলতানি আমলে স্থাপত্য শিল্প ও সংস্কৃতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- ভারতীয় উপমহাদেশে সুলতানি আমলে প্রতিষ্ঠিত স্থাপত্যশিল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- সুলতানি আমলে গড়ে উঠা উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যকর্ম সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- সুলতানি আমলে ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ বর্ণনা করতে পারবেন।

সুলতানি আমলে স্থাপত্য শিল্প

সুলতানি আমলে ভারতীয় উপমহাদেশে নতুন স্থাপত্যরীতির বিকাশ ঘটে। মুসলমানগণ এদেশে সিরিয়া, বাইজান্টাইন, মিসর ও ইরানের স্থাপত্যরীতির মিশ্রিত রূপ নিয়ে আসে। এদেশের স্থাপত্যকর্ম গড়ে উঠে এদেশের মালমসলা দিয়ে। নির্মাণকাজে নিয়োজিত হয় স্থানীয় কলা-কুশলী ও শ্রমিকগণ। সুতরাং মুসলমানগণ যে স্থাপত্যরীতি নিজেদের সাথে নিয়ে আসে তার সাথে স্থানীয় রীতির মিশ্রণ ঘটে। এর ফলে সুলতানি আমলে উপমহাদেশে এক নতুন স্থাপত্যরীতির বিকাশ ঘটে। বিশেষজ্ঞগণ এই রীতিকে ইন্দো-ইসলামি স্থাপত্যরীতি নামে আখ্যায়িত করেছেন।

কুতুবউদ্দীন আইবক দিল্লীতে কুয়ত-উল-ইসলাম মসজিদ ও কুতুব মিনার নির্মাণের কাজে হাত দেন। কুতুব মিনারের নির্মাণকাজ তিনি সম্পন্ন করতে পারেন নি। এটি পরবর্তী সুলতান ইলতুতমিস সম্পন্ন করেন। কুতুবউদ্দীন আজমীরে আড়াই দিনকা ঝোপড়া নামে একটা মসজিদ নির্মাণ করেন। আলাউদ্দীন খলজী কুয়ত-উল-ইসলাম মসজিদ বাড়ানোর পরিকল্পনা নেন মসজিদ চৌহদ্দির চার পাশে চারটি প্রবেশপথ নির্মাণের পরিকল্পনাও তাঁর ছিল। এগুলোর মধ্যে শুধু দক্ষিণপ্রান্তের প্রবেশপথটির নির্মাণ কাজ তিনি সমাপ্ত করতে পেরেছিলেন। এই প্রবেশপথে সঠিক রীতিতে খিলান ও গম্বুজ নির্মাণ করা হয়। এই খিলানকে বলা হয় সঠিক খিলান (True Arch)। পূর্বে যে খিলান নির্মিত হতো তাকে বলা হয় Corbelled বা False Arch। এই রীতিতে চাপ পড়ে সরাসরি নিচের দিকে। ফলে এসকল খিলানের উপর নির্মিত সৌধরাজি দীর্ঘস্থায়ী হতো না। সঠিক রীতির খিলান এমনভাবে নির্মিত হয় যাতে চাপ পড়ে পাশে দেয়াল বা স্তম্ভের উপর। ফলে এগুলোর উপর নির্মিত স্থাপত্য দীর্ঘস্থায়ী হয়। আলাউদ্দীন খলজী নির্মিত এই প্রবেশপথ 'আলাই দরওয়াজা' নামে খ্যাত। আলাই দরওয়াজা সঠিক স্থাপত্য রীতির কারণে ভারতে নতুন দিগন্তের সূচনা করে। পরবর্তী স্থাপত্যকর্মে আলাই দরওয়াজায় অনুসৃত স্থাপত্যরীতি প্রয়োগ করা হয়েছে। আলাউদ্দীন 'শিরি' নামে একটা নতুন শহরও নির্মাণ করেছিলেন।

ফিরোজ শাহ তুঘলকের সময় ইন্দো-ইসলামি স্থাপত্য রীতির ব্যাপক প্রসার ঘটে। তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের সমাধি নির্মাণ করেন। তাছাড়া তিনি কোটলা, ফিরোজ শাহ, হিসার ফিরোজ, ফতেহাবাদ, জৌনপুর প্রভৃতি শহর নির্মাণ করেন। তাঁর নির্মিত পুলগুলোও স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন। তাঁর নির্মিত শহরগুলো তিনি সুরম্য অট্টালিকা, মসজিদ, গোসলখানা, বাগান ইত্যাদি দিয়ে শোভিত করেন। এসকল স্থাপত্য কর্মের অনেক কিছুই এখন আর অবশিষ্ট নেই। তবে যা এখনও টিকে আছে তা স্থাপত্য রীতিতে তুঘলকদের কীর্তি ঘোষণা করছে। তুঘলক স্থাপত্য রীতিতে দেয়ালগুলো ছিল যথেষ্ট চওড়া। এজন্য তুঘলক স্থাপত্য রীতিকে বলা হয় Robust বা Military Type of Architecture.।

সুলতানি আমলে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহেও সুন্দর সুন্দর দালান-কোঠা, মসজিদ, সমাধি ইত্যাদি নির্মিত হয়। বাংলার ইলিয়াস শাহী ও হোসেন শাহী বংশের আমলে উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যশিল্প গড়ে উঠে। গৌড় পান্ডুয়ার পথে-ঘাটে এখনও এগুলোর নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ, খান জাহান আলীর সমাধি, গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ, বড় সোনা মসজিদ, কদম রসুল মসজিদ ও দাখিল দরওয়াজা তাদের স্থাপত্যকর্মের নিদর্শন বহন করে চলেছে।

জৌনপুরের আতালা মসজিদ, জাম-ই-মসজিদ এবং লাল দরওয়াজা স্থাপত্য রীতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। গুজরাট এবং মালবেও অনেক স্থাপত্যশিল্প গড়ে উঠে। বাহমনী রাজ্যে মিশ্র রীতিতে স্থাপত্যকর্ম সাধিত হয়। গুলবরগার জাম-ই-মসজিদ খুবই বিখ্যাত।

সাহিত্য-সংস্কৃতি

সুলতানি আমলে স্থাপত্য শিল্পের পাশাপাশি সাহিত্য, ইতিহাস এবং সুকুমার শিল্পেরও বিকাশ ঘটে। সুলতানগণ আরবি ও ফারসি ভাষায় কাব্য ও ইতিহাস চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এ সময় ইতিহাস সাহিত্যের চমৎকার বিকাশ ঘটে। সংগীত ও কাব্যচর্চা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হতো। কয়েকটা আঞ্চলিক ভাষাও এই সময় বিকশিত হয়। ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে মিনহাজ-উস-সিরাজের তাবাকাৎ-ই-নাসিরী, জিয়াউদ্দনি বারণীর তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, শামস-ই-সিরাজ আফিফের তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, ইয়াহিয়া বিন-আহমদের তারিখ-ই-মোবারক শাহী এই আমলে রচিত। এই গ্রন্থগুলো সুলতানি আমলের ইতিহাস জানার প্রাথমিক উপকরণ (Original Source)।

মধ্যপ্রাচ্যের বহু জ্ঞানী-গুণী মোঙ্গল আক্রমণের কারণে নিজ বাসভূমে টিকতে না পেরে ভারতে চলে আসেন। দিল্লীর দরবার ছিল তাদের জন্য নিরাপদ ও সম্মানজনক আশ্রয়স্থল। তাদেরকে আশ্রয় দিতে পেরে সুলতানগণ নিজেদেরকেই গৌরবান্বিত বোধ করতেন। আল বিরুণীর 'কিতাব-উল-হিন্দ' ভারতীয় জ্ঞানের অঁকর। আমীর খসরুর 'কিরান-উস-সাদাইন' উৎকৃষ্ট কাব্য গ্রন্থ। আমীর খসরু অতি উচুঁ মানের সংগীতজ্ঞও ছিলেন।

সিকান্দর লোদীর পৃষ্ঠপোষকতায় একটা ভেষজগ্রন্থ সংস্কৃত থেকে ফারসি ভাষায় অনূদিত হয়। হিন্দু পন্ডিতগণ অলঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্রের অনেক গ্রন্থও এ যুগে রচনা করেন। বাংলা এবং উর্দু ভাষার বিকাশও এযুগে ঘটে। বাংলার সুলতানগণ বাংলাভাষার বিকাশের জন্য হিন্দু-মুসলমান পুঁথিকার ও কবি-সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। রামায়ণ, মহাভারত বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়। ফারসি, আরবি, হিন্দি ইত্যাদি ভাষার সংমিশ্রণে উর্দু ভাষা নতুন ভাষা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সুলতানগণ অসংখ্য স্কুল, কলেজ, মক্তব, মাদ্রাসা ইত্যাদি নির্মাণ করেন। সব কিছু মিলিয়ে সংস্কৃতি চর্চা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলে।

সার-সংক্ষেপ

সুলতানী আমলে ভারতে গড়ে উঠা স্থাপত্যরীতি ইন্দো-ইসলামি স্থাপত্যরীতি নামে পরিচিত। সুলতানদের অনেকেই স্থাপত্যকীর্তি রেখে গেছেন। এই সকল স্থাপত্যকর্মের মধ্যে কুয়ত-উল-ইসলাম মসজিদ, কুতুব মিনার, আলাই দরওয়াজা ইত্যাদি বিখ্যাত। ফিরোজ শাহ তুঘলক কোটলা ফিরোজ শাহ, হিসার ফিরোজ, জৌনপুর প্রভৃতি শহর গড়ে তোলেন। বিভিন্ন প্রদেশের স্বাধীন সুলতানগণও সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, মসজিদ, সমাধি ইত্যাদি নির্মাণ করেন। বাংলায় ইলিয়াস শাহী ও হোসেন শাহী বংশের সুলতানগণ অনেক স্থাপত্যকর্ম রেখে গেছেন। জৌনপুর, গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশে সুন্দর সুন্দর স্থাপত্যকর্ম গড়ে উঠেছিল। এই সময় ইতিহাস, সাহিত্য ও কাব্যচর্চা হতো। সুলতানি আমলে স্থাপত্যশিল্প ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৩.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। মুসলমানগণ ভারতে যে স্থাপত্যরীতি গড়ে তোলেন তাকে বলা হয়–
   ক. ভারতীয় স্থাপত্যরীতি।
   খ. ইন্দো-ইসলামি স্থাপত্যরীতি।
   গ. ইসলামি স্থাপত্যরীতি।
   ঘ. মিশ্র স্থাপত্যরীতি।

২। কুতুবমিনারের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়–
ক. মুহম্মদ ঘোরীর সময়।
খ. কুতুবউদ্দীনের সময়।
গ. ইলতুতমিসের সময়।
ঘ. আলাউদ্দীন খলজীর সময়।

৩। 'শিরি' শহর নির্মিত হয়–
ক. ইলতুতমিসের সময়।
খ. বলবনের সময়।
গ. জালালউদ্দীন খলজীর সময়।
ঘ. আলাউদ্দীন খলজীর সময়।

৪। তারিখ-ই-মোবারক শাহীর লেখক–
ক. ইয়াহিয়া বিন-আহমদ।
খ. জিয়াউদ্দীন বারণী।
গ. শামস-ই-সিরাজ আফিফ।
ঘ. মিনহাজ-উস-সিরাজ।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. সুলতানি আমলে গড়ে উঠা ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ১৩ : রচনামূলক প্রশ্ন

১. সুলতানি আমলে শাসনব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
২. সুলতানি আমলে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা বিশ্লেষণ করুন।
৩. সুলতানি আমলে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা বর্ণনা করুন।
৪. সুলতানি আমলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ দিন।
৫. সুলতানি আমলের উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যশিল্প বর্ণনা করুন।
৬. সুলতানি আমলে ইতিহাস ও সাহিত্যের বিকাশ সম্পর্কে ধারণা দিন।

উত্তরমালা

পাঠ ১৩.১	ঃ	১. গ	২. ঘ	৩. ক	৪. খ	৫. ঘ
পাঠ ১৩.২	ঃ	১. খ	২. ক	৩. ঘ	৪. গ	
পাঠ ১৩.৩	ঃ	১. ঘ	২. ক	৩. খ	৪. গ	
পাঠ ১৩.৪	ঃ	১. খ	২. গ	৩. ঘ	৪. ক	